সাধারণ অর্থে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। শিক্ষা কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলির পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যেসব দক্ষতা প্রয়োজন, সেগুলো অর্জনে সহায়তা করে। আর কারিকুলাম হলো শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মূল্যায়নের কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচি এই সবকিছুই কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রায় শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা, প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের সমতা অর্জন, উপবৃত্তি, বছরের শুরুতেই আদিবাসীসহ সব শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্তসংখ্যক নারী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। করোনাকালে বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রয়াসের মাধ্যমে উল্লিখিত অর্জনগুলো ধরে রাখার জন্য তারা প্রশংসার দাবি রাখে।

advertisement 3

ইউনেস্কো ও শিক্ষাবিদদের আশঙ্কা, করোনার ফলে পারিবারিক অর্থ সংকট, শিশুশ্রম, বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, ঝরে পড়া, অপুষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকির কারণে শিক্ষা খাতের গত ২০ বছরের অগ্রগতি হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। করোনা মহামারির কারণে শিক্ষার ক্ষতির গভীরতা, ব্যাপকতা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এর অভিঘাত নিরসন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত ধারায় ফেরানোর জন্য সমন্বিত শিক্ষা পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

advertisement 4

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভৌত অবকাঠামোর জরুরি সংস্কার, শিক্ষণ-শিখন সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিরাপদ খাবার পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ছিল।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিশেষ করে ৪ নম্বর অভীষ্ট (এসডিজি-৪) এর কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য করব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কার তথা প্রগতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সব অভিভাবক, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করা প্রয়োজন।

শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা খাতে ক্রমান্বয়ে বৈষম্য দূর করা হবে- শহর ও গ্রামের, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য, নারী-পুরুষ, সাধারণ ও কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে বৈষম্যের অবসান ঘটানো হবে। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে বারবার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ডক্টর কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠিত হয়। যা কুদরাত-এ-খুদা কমিশন নামে পরিচিতি পায়। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আগে ৬টি কমিশন কাজ করে। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থায় সব বিষয় কার্যকর হয়নি বা অনেক কমিশনের রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। বারবার শিক্ষাপদ্ধতিতে রদবদল করেও সঠিক মান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই মনে হয়। এতে শিক্ষাব্যবস্থার অগোছালো ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা কারিকুলামেও পরিবর্তন আসবে এটাই স্বাভাবিক।

গত দুই যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় যে দুটি বিষয় শিক্ষা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে এবং নকল বন্ধের যুক্তিতে ১৯৯২ এমসিকিউ পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া ও বর্তমান সময়ে দক্ষতাভিত্তিক (এমসিকিউ) ও সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ। এ দুটি বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, এ নীতিগুলো কার্যকর ফল প্রদান করেনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ দুটি পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হয়নি।

শিক্ষার্থীদের অধিক যাচাইয়ের কথা বলা হলেও সেভাবে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়নি, এমনকি বাজারে প্রচুর পরিমাণে গাইড বইয়ের আগমন ঘটে। যার ফলে এ পদ্ধতি থেকে সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি অনুমোদন পাওয়া বিষয়গুলো আলোচনার আগে জানা দরকার কী কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রয়েছে নতুন কারিকুলামে। চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২২ থেকে জানা যায় এ শিক্ষানীতি কার্যকর হবে আগামী শিক্ষা বছর থেকে। ২০২৩ সালে প্রাথমিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এবং মাধ্যমিকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এবং ২০২৪ সালে তৃতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে এ কারিকুলামে পাঠদান করা হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে পুরোপুরি কার্যকর হবে এ কারিকুলাম। কারিকুলামে উঠে আসা মূল আলোচিত বিষয়গুলো হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুদিন ছুটি, তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা না রাখা, সব শ্রেণিতেই শিক্ষকদের হাতে নম্বর, পিএসসি, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা বাতিল, স্কুলপর্যায়ে বিভাগ বিভাজন না থাকা, পাবলিক পরীক্ষায় যোগ হবে শিখনকালীন মূল্যায়ন, এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি বদল এবং একাদশ ও দ্বাদশে আলাদা পাবলিক পরীক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূল পরিবর্তিত বিষয়ের দিকে। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা থাকছে না। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) যা চলে আসছে ২০০৯ সাল থেকে এবং ২০১০ সালে শুরু হওয়া ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা (পিডিসি) বন্ধ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমানোর লক্ষ্যে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাবিদরা এ ব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান নিলেও অভিভাবকরা চিন্তিত শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে পড়ালেখার আগ্রহ কমে যাবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বাতিল হচ্ছে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষাও। এসব পরীক্ষা বাদ দেওয়ার ফলে প্রাইভেট ও কোচিং প্রবণতা অনেকটাই কমে আসবে এটা সবার বিশ্বাস। এসব পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির শিক্ষক ও পেশাদার কিছু প্রাইভেট টিউটর প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্য ঘরে তুলেছিল। সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি লক্ষণীয় তা হলো বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া। এটা নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একটা পক্ষ বলছে, এতে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলো আয়ত্তে আনতে কষ্ট হবে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও গণিতেও শ্রেণিকক্ষে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে ৬০ ভাগ। আর পরীক্ষার মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে ৪০ ভাগ। নবম ও দশম শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন ৫০ আর পরীক্ষার মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫০ ভাগের কথা বলা হয়েছে। আর কিছু বিষয় থাকবে কেবল শিখনকালীন মূল্যায়নের ওপর। এ নীতির আলোকে এটা স্পষ্ট যে, ক্লাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের শিক্ষক সমাজ কতটুকু প্রস্তুত রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো মানের শিক্ষক সংকট চরমে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে আবশ্যিক বিষয়ে শিখনকালীন মূল্যায়ন ৩০ শতাংশ এবং পরীক্ষা হবে ৭০ শতাংশ, অর্থাৎ পাবলিক পরীক্ষা দিতে হবে ৭০ শতাংশ। নৈর্বাচনিক ও বিশেষায়িত বিষয়ে কাঠামো ও ধারণায়ন অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য উপায়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে। প্রায়োগিক বা ঐচ্ছিক বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে শতভাগ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির ওপর প্রতি বর্ষ শেষে একটি করে পরীক্ষা হবে। এ দুই শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে এইচএসসির চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা প্রস্তাবিত কারিকুলামকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। এ ধরনের সুপারিশ কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রস্তাবেও ছিল। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিকতা বোধসম্পন্ন জাতি গঠনে যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য।

২০২৩ সালে যে নতুন শিক্ষাক্রম আসছে তাতে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন দেখব বলে আমরা আশা করছি সেটা হলো শিক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন। আমাদের বর্তমান শিক্ষককেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত সাত রকমের বুদ্ধির প্রতিটিকে বিকশিত ও শানিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যেসব ¯ুংলে পাইলটিং চলছে, সেখানকার শিক্ষার্থীরা এখন খুব আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে এসব বুদ্ধি চর্চায় নিমগ্ন। আগে মূলত ভাষিক ও গাণিতিক বুদ্ধিচর্চার সুযোগ ছিল। ফলে যেসব শিক্ষার্থীর এসব ক্ষেত্রে আগ্রহ ছিল, তারাই আনন্দ পেত বা ভালো করত, অন্যরা মনমরা হয়ে কষ্টে-সৃষ্টে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতো। নতুন শিক্ষাক্রমে সবাই যেহেতু নিজের পছন্দমতো বুদ্ধিচর্চার সুযোগ পাবে, এখন ওইসব ক্লাসে এমন কাউকে পাওয়া দুষ্কর, যে স্কুলে যেতে কিংবা ¯ুংলে আরও বেশি সময় থাকতে চাইবে না। আশা করা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের দিক থেকে নতুন শিক্ষাক্রমের কোনো সমস্যা থাকবে না। সমস্যা হবে শিক্ষক প্রশিক্ষণে। এক বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষককে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ তো দিতেই হবে, সামনের বছরও এ প্রশিক্ষণের কার্যক্রমটি অব্যাহত রেখে তাদের চৌকস করে তুলতে হবে। সেটি হলেই আমরা আসলে আমাদের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশ ও গুণগত শিক্ষা অর্জনের পথ খুঁজে পেলাম কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।